



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 01 - 06

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ : নবরূপে চন্ডীমঙ্গল

সত্যজিৎ সরকার

গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : satyajitsarkar7@gmail.com

ও

ড. সুনিমা ঘোষ

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : sunimaghosh70@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Introduction,
Chandimangal.
Dhanapatir
Sinhalyatr,
Similarites,
Characters,
Modern
Significance.

Abstract

Ramkumar Mukherjee's novel 'Dhanpati's Sinhala Yatra' is also medieval in terms of language. The novel has been reimagined by Chandimangal. Ramkumar Mukherjee has adopted the first part of the narrative of the merchant section in his novel. From Dhanpati's Sinhala Yatra to captivity. Here, the novelist has looked back at medieval Bengal and Bengalis from a distance of several centuries, keeping Mukund's poetry in front of him. He has made no attempt to drag the past into the present. Nor has he taken the present into the past and placed it there. In this book, the past cannot be seen in the present and the present in the past. A pure historical setting has been created where there is no shadow of the twenty-first century. Chapters such as the lifting of the Saptadanga, Dhanpati's journey to the Dingaghata, Ajay Yatra, Muktabeni, and the journey of rivers and streams describe extinct rivers, towns, etc. The novel contains themes such as mythological consciousness, religious ideals, and a reevaluation of divine consciousness. Dhanpati traveled to the southern country in the hope of prosperity. However, his fate and destiny were determined by the hideous plots and cruelty of two goddesses. Ignoring many ominous signs and the desperate pleas of Khulna, Dhanpati has to travel helplessly towards the inevitable end. This is his destiny. Ramkumar Mukherjee has presented the novel 'Dhanpati's Singhal Yatra' in a magical bond of intense fascination with the tradition of Bengali cultural heritage. The novel has a unique and modern reconstruction of the well-known Afghan poem of the medieval 'Chandimangal'. The novelist has kept the basic structure of the story intact here, but has analyzed the psychological depth of the characters and the socio-economic context of the time from a modern perspective. As a result, it

emerges as a picture of the conflict between man and time instead of the story of the greatness of the Goddess. In the novel, Dhanpati is a prosperous merchant of Ujjainnagar, but he has endless questions and doubts about the social system of the time. He wants to magnify the efforts and logic of man instead of the miracles of the conventional gods and goddesses. This rational mind has taken him against the conventional beliefs and conventional customs. And later it has become the main reason for the conflict in his life. On the king's orders, Dhanpati has to undertake a journey to Sinhala despite his reluctance. Before the journey, the wish of his husband for his well-being did not open, so when the puja of Goddess Chandi was organized, the rational, confident, and realistic leader trampled the auspicious place of the Goddess with contempt. To him, the greatness of the Goddess is irrational and miraculous. However, the author portrays this insult not only as an insult, but as a clash between traditional beliefs and modern logic. The novel is not just a religious story, but also a story of human survival in the face of adversity. Overall, the novel has become a reinterpretation of the medieval 'Chandimangal' poem.

Discussion

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চার-পাঁচশো বছর অতিক্রম করে আধুনিক কালেও বিনির্মিত হয়ে অর্জন করেছে বহুমুখী ব্যাপ্তি। অনেক আধুনিক সাহিত্যিক একালেও মধ্যযুগের সাহিত্যকে আশ্রয় করে সাহিত্য রচনা করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী অনেকাংশেই কেবল প্রেম-ভক্তির গান। কিন্তু, মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এমন একটি ধারা, যেখানে তৎকালীন সমাজ চিত্র বেশ সুস্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। পদ্যে লেখা মধ্যযুগীয় সাহিত্য অনেকাংশে কথাসাহিত্যের মতোই। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলোতে 'কথা' অর্থাৎ 'গল্প'ই মুখ্য। কাব্যগুলি আখ্যান নির্ভর। তৎকালীন সাহিত্যচর্চা, ইতিহাসচর্চা উচ্চবর্গীয় ভূ-স্বামী, জমিদার, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছিল। ইতিহাস লেখকগণ তাই উচ্চবর্গের বংশপরিচয় রক্ষায় যত্নশীল ছিলেন। তাঁদের লেখা ইতিহাস অনেকাংশেই একমাত্রিক। কিন্তু, মঙ্গলকাব্যে কাহিনির আড়ালে অনায়াসে প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা। বাংলা মূলত অনার্য অধ্যুষিত দেশ এবং বাঙালি মিশ্র জাতি। উন্নততর আর্যধর্ম ও সভ্যতার হাজার বছরের চাপে বাঙালি আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। তুর্কি আক্রমণও প্রাকার্য ও আর্য সংস্কৃতিকে মিশে যেতে সহায়তা করেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও নিম্ন ও উচ্চ বর্ণের সমন্বয়ে মনসা, চন্ডীর মতো কোপনস্বভাবা দেবীর অভ্যুত্থান দেখা যায়। এয়েন এক দেবতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আর এক দেবতাকে বসানো। মধ্যযুগে সমগ্র পূর্ব ভারতে চন্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্য পালা করে গীত হত। ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গলের অধিক বিস্তৃতির কারণ হয়তো সাপের প্রাদুর্ভাব। তবে, আধুনিকালে বঙ্গসাহিত্যের সাহিত্যিকেরা চন্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল-উভয় ধারাকে নিয়েই সাহিত্য রচনায় প্রায় সমান আগ্রহী।

মনসামঙ্গল কাব্যকে অবলম্বন করে 'চাঁদবেনে' নামে দুটি উপন্যাস লেখা হয়েছে। একটির লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার, অন্যটির বাংলাদেশের সেলিনা হোসেন। শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাগরের নৌকা', শেখর দেবনাথের 'মনসাকথা' নাটক মনসামঙ্গল কাব্য দ্বারা প্রভাবিত। জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, মনসামঙ্গলের কাহিনি বা চরিত্রকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখন্ড' ও 'বেনে বউ'-এর বিষয়বস্তু চন্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে গৃহীত। 'ব্যাধখন্ড' কালকেতু উপখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং উপস্থিত। উপন্যাসটিতে সংবেদনশীল ব্রাহ্মণ পুঁথি-লেখক মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখনীতে ব্যাধ-সমাজের বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। 'বেনে বউ' উপন্যাসটি বণিক খন্ডের লহনা-খুল্লনা কথাবৃত্তের নবচিত্রায়ন। উপন্যাসে পরিবার জীবনের নারী অসহায়তার চিত্র আছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সর্বার্থেই মধ্যযুগের মানুষের জীবন কথা। ব্রাহ্মণ, বনিক, রাজা, জমিদার, ডিহিদার, ব্যাধ, চোয়াড়, ডোম- সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শখ-আহ্লাদ, ব্যথা-বেদনা, আবেগ-অনুভূতির কথা এখানে চিত্রিত হয়ে আছে। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিমণ্ডল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর

মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পরিধেয়, সংস্কার ও সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে মঙ্গলকাব্যের ছত্রে ছত্রে। কাব্যের বাহ্যিক অংশে অবশ্যই দেব দেবীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তবে অভ্যন্তরে মানুষেরই দুঃখ-দুর্দশা, সুখ-আনন্দ, আশা-নিরাশার কাহিনি রয়েছে। বাংলার মানুষ তখন এমন এক শক্তির কাছে মাথা নত করতে চেয়েছে, যার কাছে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে আর পাওয়া যাবে পার্থিব সমৃদ্ধি। বহুদেবতাবাদ এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য। তাই, মঙ্গলকাব্যধারা যতটা পৌরাণিক বা লোকপুরান নির্ভর, ততটা ঐতিহাসিকও। তৎকালীন ইতিহাস-লেখক অধিকাংশ সময়েই উচ্চবর্গের বংশপরিচয় রক্ষণে প্রবৃত্ত ছিল। রাজা বা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত হওয়ার কারণে একমাত্রিকও ছিল। সাহিত্যচর্চাও তখন হতো রাজা অথবা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়। সেখানেও রাজার গুণগান নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছে। তবু, শিল্পের এটা বৈশিষ্ট্য যে, সৃষ্টির অভ্যন্তরে শিল্পী বাস্তবতাকে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলেন। অনেক সময় শিল্পীর অজান্তেই তাঁর কলম সাধারণ মানুষের কথা শুনিয়ে যায়। সেদিক থেকে মধ্যযুগীয় সমাজের বাস্তবতাকে চিনতে, সেই সময়কে অবলোকন করতে মঙ্গলকাব্যধারার গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকের হুবহু ইতিহাস বর্ণনার দায় থাকে না। তবু বহু উপন্যাস ইতিহাসের বহু তথ্য নিজের মলাটে বন্দি করে রাখে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল - ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিষয়গত দিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও, ভাষার দিক থেকে সেগুলি ‘আধুনিক’। অবশ্য এক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্যই ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসটি ভাষার দিক থেকেও মধ্যযুগীয়। উপন্যাসটি চন্ডীমঙ্গলের নবরূপ লাভ করেছে।

সমগ্র চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি তিনটি অংশে বিভক্ত - দেবখন্ড, আখ্যটিক খন্ড ও বণিক খন্ড। বণিক খন্ডের অংশবিশেষ অবলম্বন করেই আলোচ্য ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই চন্ডীমঙ্গল রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে পাঠককে সেই সময়কালেই নিয়ে গেছেন। বণিক খন্ডের প্রধান চরিত্র ধনপতি সদাগর বাণিজ্যযাত্রায় সিংহল গিয়েছিলেন। সমুদ্রপথে তিনি দেবী চণ্ডিকার দর্শন পেয়েছিলেন। দেবী তাকে মোহময়ী কমলেকামিনী রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। অসাধারণভাবে কাব্যে বর্ণিত হয়েছে দেবীর এই রূপ। পদ্মাসনা যুবতী দেবী গ্রাস করছেন এবং উগরে দিচ্ছেন হাতি। এই রূপ দর্শনের পর ধনপতি সিংহলরাজের কাছে পৌঁছে দেবীর এই রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। সিংহলরাজ ধনপতির কথা মেনে নিতে পারেননি। ধনপতিকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করেছেন। রাজা ও বণিকের মধ্যে তর্ক বেধেছে। রাজা হুশিয়ারি দিয়েছেন, দৃশ্যটি দেখাতে না পারলে বন্দী থাকতে হবে কারাগারে। অবশেষে রাজাকে নিয়ে ধনপতি সমুদ্রে গিয়েছেন দেবীর কমলেকামিনী রূপ দর্শনের জন্য। কিন্তু দেবী দর্শন দেননি। ফলস্বরূপ ধনপতি সিংহলে কারারুদ্ধ হয়েছেন। তারপরেও তিনি কমলেকামিনী রূপেরই আরাধনা করেছেন। দেবী ভিন্ন রূপে তাকে বহুবার লোভ দেখিয়েছেন কিন্তু দৃঢ়চেতা ধনপতি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কমলেকামিনী ছাড়া অন্য কোনরূপের আরাধনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ধনপতি যখন ব্যবসায় গিয়েছিলেন তখন তার পুত্র শ্রীমন্ত শিশু ছিল। যৌবনে উপনীত হয়ে সে বাণিজ্য ও পিতার সন্ধানের জন্য সিংহলে পাড়ি দিয়েছে। একইভাবে কমলেকামিনী দর্শন করেছে। সেরূপের বর্ণনা দিয়ে রাজার সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছে। রাজাকে নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছে। কিন্তু দেবী এবার প্রসন্ন হয়ে কমলেকামিনী রূপে দর্শন দিয়েছেন। দেবীর এই রূপের দর্শন পেয়ে সকলে কৃতার্থ হয়েছেন। শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহল রাজকন্যার বিবাহ হয়েছে। বেশ কিছু কাল কাটিয়ে শ্রীমন্ত সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন বণিক খন্ডের আখ্যানের প্রথম অংশটি। ধনপতির সিংহল যাত্রা থেকে বন্দীদশা পর্যন্ত। এখানে ঔপন্যাসিক মুকুন্দের কাব্যকে সামনে রেখে কয়েক শতাব্দীর দূরত্ব থেকে ফিরে দেখেছেন মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালিকে। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার কোনো চেষ্টা তিনি করেননি। আবার বর্তমানকে অতীতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েও দেননি। এই গ্রন্থে অতীতকে বর্তমানে ও বর্তমানকে অতীতে দেখা যায় না। বিশুদ্ধ এক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে যেখানে একবিংশের কোনো ছায়া নেই। সপ্তডিঙ্গা উত্তোলন, ধনপতির ডিঙাঘাটায় গমন, অজয় যাত্রা, মুক্তবেণী, নদ-নদীর মগরা গমন প্রভৃতি অধ্যায়ে অবলুপ্ত নদী, জনপদ প্রভৃতির বর্ণনা উঠে এসেছে। ‘নয় দীয়া, নয় দ্বীপ’ অংশে ঔপন্যাসিক নবদ্বীপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, -

“নিশিজাগর সাধু ধনপতি দূর থেকে দেখে নবদ্বীপের আকাশে দীপমালার দীপ্তি। দীপস্তুভ নেই, দীপশিখা নেই কিন্তু বত্রিশরতি স্বর্ণের বিভা আগুন গগনে। সপ্তডিঙার শত-সহস্র প্রদীপও তার কাছে ম্লান। ডিঙাবাতিতে জ্যোতি আছে, দুটি নেই। কোন মৃত্তিকায় সাধু নির্মাণ করেছিল নয় দীপ, কোন স্নেহে পূর্ণ করেছিল বর্তি আধার, কোন তুল আবর্তনে তৈরি করেছিল দীপবর্তি? সাধু ধনপতি ভাবে অজ্ঞাত সাধুর কথা যার নয় দীপ হতে এই ভূখণ্ড নাম পেল নবদীপ। দিনে দিনে জনমুখে দীপ হল দ্বীপ।”^১

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক পুরনো বাংলা শব্দ। যেমন, ‘ধড়ি’ অর্থাৎ পরিধান বস্ত্র; ‘গ্রাহবতী’ অর্থাৎ হিংস্র জলজন্তুপূর্ণ, ‘গেহ-গারি’ অর্থাৎ ঘর সংসার। ভাষাটি রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। ভাষাটি মধ্যযুগের সাহিত্যের ভাষা। কথার ছন্দে বাঁধা সরল বাংলা ভাষা। এ ভাষার সারল্য পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করে। এভাষার শক্তিও অনেক - কৃতিবাস, কাশিদাস, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, বৃন্দাবন দাস এই ভাষাতেই অমরত্ব অর্জন করেছেন।

উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে পুরাণচেতনা, ধর্মীয় আদর্শ, দৈব চেতনার নবমূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়। কাহিনি অংশে দেখা যায়, রাজভান্ডারে চন্দনকাঠ, লবঙ্গ সৈন্ধবলবণ, পান্না, নীলা, মানিক, প্রবাল, মোতি, শঙ্খ, সুপুরি প্রভৃতি আনার উদ্দেশ্যে সিংহল পাটনে যাওয়ার জন্য ধনপতির ডাক পড়ে। ধনপতির এই যাত্রায় কোন আগ্রহ নেই। এর আগে রাজার আদেশে গৌড় পাটনে গুণ-শারির স্বর্ণ পিঞ্জর তৈরি করতে গিয়েছিলেন ধনপতি। সেই যাত্রার সময় লহনা ও খুল্লনার সংসারে নেমে এসেছিল অশান্তি। সদাগরের অবর্তমানে বড়ো বউ লহনা ছোটো বউ খুল্লনাকে ছাগ রাখালিতে বনে পাঠিয়েছিল। তাছাড়াও, পিতা জয়পতির ডিঙাগুলির অবস্থাও খারাপ। তলাগুলি পচে গেছে। হালেও ঘুণ ধরেছে। মকর, তিমি, কুমির আক্রমণ করলে এই দুর্বল ডিঙা নিয়ে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তাই সংসার সুখ ছেড়ে সাগরে ভাসার দুঃখ ধনপতি নিতে চান না। কিন্তু রাজার আজ্ঞা অমান্য করাও তো সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে বাণিজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ধনপতির জলযাত্রার সংবাদে খুল্লনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তখন সে ছয়মাসের গর্ভবতী। ধনপতি তাকে জানায়, এই আদেশ কোনমতেই অমান্য করা যাবে না। তাকে নিজের যত্ন নিতে বলে এবং সন্তান হলে তারও যত্ন নিতে বলে। পুত্র হলে নাম রাখতে বলে শ্রীপতি এবং কন্যা হলে নাম রাখতে বলে শশীকলা।

ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে গন্ধবনিক পল্লীতে তরণীপূজার আয়োজন চলতে থাকে। লেখক এ প্রসঙ্গে বহু প্রাচীন ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দিয়েছেন যারা ব্যবসা করে অর্থশালী হয়ে উঠেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায় লেখক সপ্তডিঙার বর্ণনা দিয়েছেন -

১. “যে ডিঙাটি প্রথম তোলে তার নাম মধুকর। দৈর্ঘ্য যেমন দিগন্তবিস্তারী, প্রস্থে তেমনি সুদূরবিস্তৃত। নৈকাঠে তার অলৌকিক নির্মাণ। সম্মুখভাগ সুচত্র আর পশ্চাৎ গোলাকৃতি।...ডিঙার গায়ে দারুণ অপরূপ কারুকার্য।”^২
২. “পরের ডিঙা দুর্গাবর গাম্ভীর্য ও ডহু-দারু নির্মিত জলযান। অভিনব, অবিরাম, মোহন তার রূপ।”^৩
৩. “পরের ডিঙা শঙ্খচূর। কাঁঠাল পিয়াল ইত্যাদি দারুণ পাটি ও গজালে এই জলযান।”^৪
৪. “ডুবুরি তোলে চন্দ্রপাল। দৈবসার ও তমাল বৃক্ষের পাটি দিয়ে তৈরি এক মালবাহী জলযান।”^৫
৫. “পরের ডিঙা ছোটোমুঠি। আকার যেন বজরার হাতল। শাল, পিয়াল, ডহু কাঠের পাটিতে তালের গজাল।”^৬
৬. “ডুবুরি তোলে গুয়ারেখি ডিঙা। চেহারা খানি যেন গুয়া মাপার কুশী।”^৭
৭. “সাতখানি ডিঙা তোলে ডুবুড়িয়া।”^৮

এই সপ্তডিঙা নিয়েই জয়পতির ছেলে ধনপতি পাড়ি দেবে দক্ষিণে। তার বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঁচবে দেশ। উজ্জয়িনী থেকে উজ্জয়িনীগরে উপনীত হওয়ার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যের যাত্রাপথ। ভ্রমরার ঘাটে শত এয়োবতীর উলুধ্বনি ও শঙ্খ ধ্বনির মধ্য দিয়ে তরণী পূজা সমাপ্ত হলে একসময় ঘৃত-প্রদীপ নিয়ে সকলে চলে যায়। সপ্তডিঙার কোল নানা সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে কিন্তু খুল্লনার অন্তরটি শূন্য হয়ে যায়। তাই গোপনে চন্ডীর ঘট পেতে পূজা

করে। তার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। কেমন করে শশীহীন রাতে অচেনা নদী জলে ভেসে থাকবে, কেমন করে পার হবে বিপদ সংকুল ইছানি, কমলাপুর, চক্রঘাটা, পদ্মাবতী, মুকুরপুর, প্রয়াগ, ত্রিপিণী, সাগরসঙ্গম, মগরার বাঁক। দরজার আড়াল থেকে খুল্লনার চন্ডি পূজার ঘটটি দেখে নেয় লহনা। তার মনে হয় খুল্লনা ডাকিনীর মন্ত্র পাঠ করছে। ভয়ে আশঙ্কায় লহনা নদীঘাটে সমস্ত ঘটনা ধনপতিকে জানায়। শৈব ধনপতি খুল্লনার পূজা গৃহে এসে চন্ডি, চামুন্ডার পূজা দেখে মেনে নিতে পারে না। চন্ডীর ঘটে আঘাত করে। তার পায়ের আঘাতে ছিটকে যায় মঙ্গলঘট। ধনপতির এই উদ্ধৃত্য চন্ডীর সহ্য হয় না। এরপর দেবীর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঔপন্যাসিক এই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান সম্পূর্ণ নতুনভাবে। দেবীর দৈবমহিমা বিলুপ্ত করে, সম্পূর্ণ আধুনিক এক সংকীর্ণমনা নারীসত্তার জাগরণ ঘটায়। ঈর্ষায় চন্ডি তাঁর সমস্ত কথা পদ্মাবতীকে জানিয়েছেন। পদ্মাবতী সমস্ত উজানীনগর ধ্বংস করে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশ প্রাথমিকভাবে দেবী চন্ডীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অসহায় নারীর মতো বলেছেন, -

“চন্ডীর পূজারিণী খুল্লনাকে লাঞ্ছনা করে ধনা বান্যা, অথচ আমি অসহায়। এর চেয়ে হোমে আত্মাহুতি ভালোরে পদ্মাবতী। বুকের অনল যে যজ্ঞের অনলের চেয়েও দাহ্য মা।”^৯

এবং শেষ পর্যন্ত চন্ডি পদ্মাবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে ধনপতিকে বাঁচিয়ে রাখা হবে এবং ঠিক সময়ে তার অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তার ছয়খানা ডিঙা ডুবিয়ে সিংহলে তাকে বন্দী করা হবে।

সমৃদ্ধির আশায় ধনপতি দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেছিল। অথচ তার ভাগ্য ও পরিণতি নির্ধারিত হয়ে যায় দুই দেবীর ঘৃণ্য চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে। অনেকগুলি অমঙ্গলের সংকেত ও খুল্লনার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে অনিবার্য পরিণতির দিকে ধনপতিকে অসহায় ভাবে যাত্রা করতে হয়। এটি তার নিয়তি। এখানে ঔপন্যাসিক কৌশলে উপস্থাপন করেছেন মনসামঙ্গলের মিথ, সিংহল দ্বীপ ও রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মনোভাব -

“রাধিকা একাকী আসত নদীকূলে, সঙ্গেপনে, মধ্যরাতে। আর এখন শতনারী সন্ধ্যারাতে হলুধনি দেয় ভ্রমরার কূলে? কানাই বাজাত বাঁশি কদমের ডালে বসে, আর উজানী নগরের নাগরেরা বাজায় দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, ভেরি। কৃষ্ণ -রাধিকার ছিল একখানি তরী আর এদের সগুডিঙা। কী কালই এল।”^{১০}

এখানে মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণলীলা সব যেন একাকার হয়ে গেছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় ‘ধনপতির সিংহলযাত্রা’ উপন্যাসটিকে উপস্থাপিত করেছেন বাঙালি সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম্পরার সঙ্গে নিবিড় মুগ্ধতার মায়াবন্ধনে। উপন্যাসটিতে মধ্যযুগীয় ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যের সুপরিচিত আখ্যানের এক অভিনব ও আধুনিক পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। ঔপন্যাসিক এখানে কাহিনির মূল কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কিন্তু চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা ও তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে আধুনিকতার দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে, এটি দেবী মাহাত্ম্যের কাহিনির পরিবর্তে মানুষ ও সময়ের সংঘাতের চিত্র রূপে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে ধনপতি উজানীনগরের সমৃদ্ধ বণিক কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের অন্ত নেই। তিনি প্রচলিত দেবদেবীর অলৌকিকত্বের বদলে মানুষের প্রচেষ্টা ও যুক্তিকে বড়ো করে দেখতে চেয়েছেন। এই যুক্তিবাদী মন তাঁকে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে। এবং পরবর্তীতে এটি তাঁর জীবন সংঘাতের মূল কারণ হয়ে উঠেছে। রাজার আদেশে ধনপতিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহল যাত্রা করতে হয়। যাত্রার পূর্বে খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবী চন্ডীর পূজা আয়োজন করলে যুক্তিবাদী, আত্মবিশ্বাসী, বাস্তববাদী দলপতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেবীর মঙ্গলঘট পদদলিত করেন। তাঁর কাছে দেবীমাহাত্ম্য যুক্তিহীন ও অলৌকিক। তবে লেখক এই অপমানকে কেবল অপমান হিসেবে নয়, প্রচলিত বিশ্বাস ও আধুনিক যুক্তির সংঘাত হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমুদ্রপথে দেবী চন্ডীর ক্রোধে ধনপতির বাণিজ্যতরি ডুবে যায়। ঔপন্যাসিক এটিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপ ও মানুষের অসহায়তার প্রতীকে চিত্রিত করেছেন। ধনপতি দেবীর অলৌকিক রূপ দেখেছেন। তাঁর যুক্তিবাদী মন এই দৃশ্যকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সিংহলে পৌঁছে রাজাকে এ অবিশ্বাস্য কাহিনি জানিয়েছেন। মিথ্যাবাদী তকমায় ধনপতিকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। উপন্যাসে অসংখ্য মিথ ভেঙ্গে রামকুমারবাবু কাহিনির নতুন আঙ্গিক গঠন করেছেন। উপন্যাসটিতে তিনি অলৌকিকতাকে সরাসরি গ্রহণ করেননি। তিনি এটিকে দেখিয়েছেন মানব মনের সংশয়, বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার অঙ্গ হিসেবে। আধুনিক কালের পাঠককে দিয়েছেন চন্ডীমঙ্গলকালের সময়ের আশ্বাদ। চন্ডীমঙ্গলের



চিরপরিচিত চরিত্রগুলোকেও নবরূপ প্রদান করেছেন। দেবীর রোষে ভাগ্যের দ্বারা প্রতারিত সর্বস্বান্ত ধনপতি হয়ে উঠেছেন প্রকৃতির দ্বারা বিপদগ্রস্ত অসহায় চরিত্র। চন্ডীমঙ্গলের খুল্লনা সতী নারী, দেবীর ভক্তিতে একনিষ্ঠ। কিন্তু উপন্যাসে তিনি দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি নিজের বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকেন। সতীন লহনার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও নিজের আরাধ্যার প্রতি বিশ্বাস হারান না। স্বামীর বিশ্বাসের সঙ্গে তার নিজের বিশ্বাসের যখন সংঘাত বাঁধে তখন তাকে গভীর মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে দেখা যায়। এই মানসিক দ্বন্দ্বই খুল্লনাকে আধুনিক নারীতে রূপান্তরিত করেছে। লহনাও এখানে সরলরৈখিক খলনায়িকা নন। খুল্লনার প্রতি দুর্ব্যবহারের পেছনে রয়েছে নিরাপত্তাহীনতা, বঞ্চনার ভয়। এ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীর অসহায়তার চিত্র। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহ ও খুল্লনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ লহনার মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, যা তাকে নিষ্ঠুর করে তোলে। চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসটির বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসে চন্ডীমঙ্গলের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে আধুনিক মনস্তত্ত্ব ও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে। ফলস্বরূপ, উপন্যাসটি শুধু ধর্মীয় কাহিনি নয়, প্রতিকূলতার মুখে জীবন সংগ্রামে মানুষের টিকে থাকার কাহিনি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যের নবরূপায়ন।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : ধনপতির সিংহলযাত্রা, চতুর্দশ মুদ্রণ, কলকাতা, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: ডিসেম্বর ২০২৪, পৃ. ১০৩
২. তদেব, পৃ. ২০
৩. তদেব, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ২১
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ২১
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. তদেব, পৃ. ২২
৯. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার : ধনপতির সিংহলযাত্রা, অনুষ্ঠপ, শীত সংখ্যা, বর্ষ- ৪১ : ২য় দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৫০৭
১০. তদেব, পৃ. ৪৮৮